সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা

অগ্রণী ব্যাংক বক্তৃতামালা ২০১০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ মে ২০১০

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল দায়িত্ব হলো মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অর্থনীতিতে ঋণ প্রবাহের গতিধারা সুনিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনশীল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২, সংশোধিত ২০০৩) । একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক ও পরিবেশ-বান্ধব টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমান সময়ে সংকুলানধর্মী (accommodative) ও বাস্তবানুগ (pragmatic) মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণ করছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে । তারই অংশ হিসেবে কৃষি, এসএমই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী যেমন সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করেছে । দেশের প্রত্যন্ত জনপদে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা ও মোবাইল ফোন কোম্পানীর মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক cost-effective নতুন নতুন সৃজনশীল সেবা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । তাছাড়া, ব্যাংকগুলোর মানবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে সিএসআর (corporate social responsibility) কর্মসূচীর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । মূলতঃ সুবিধে বঞ্চিত শ্রেণীর সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টিসহ নানামাত্রিক সামাজিক দায়-বদ্ধ কর্মকান্ডের দিকে নজর দেবার জন্যে ব্যাংকগুলোর মন বদলের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিচক্ষণ মুদ্রানীতি, উৎপাদনশীল খাত বিশেষ করে কৃষি, এসএমই খাতে পর্যাপ্ত ঋণের প্রবাহ, দক্ষভাবে আর্থিক খাতের তদারকি, ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমূখী শিল্পে সরকারের সময়োপযোগী প্রণোদনা প্যাকেজ ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি (social safety net) সম্প্রসারণের কারণে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিশ্বমন্দার ক্ষতিকর প্রভাব কম পড়েছে; যদিও মন্দাগ্রস্ত পশ্চিমা রপ্তানী বাজারে চাহিদা দুর্বলতার কারণে দেশের রপ্তানী আয়ে কিছু সময় নিম্নগতি বিরাজমান ছিল । তবে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহের কল্যাণে দেশের অভ্যন্তরীণ জোরালো চাহিদা পরিস্থিতি বিরাজমান থাকায় সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো সন্তোষজনক ছিল । ফলে একটি সহনীয় মূল্যস্ফীতিসহ এ বছর প্রায় ৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ ।

যে সকল দেশ বৈশ্বিক মন্দা মোকাবিলায় অধিকতর সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ তাদের অন্যতম । পশ্চিমা বিশ্বের বাজারে সৃষ্ট চাহিদা দূর্বলতার প্রেক্ষাপটে চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মতন

বাংলাদেশও মন্দা মোকাবিলায় সফল হয়েছে । কারণ, বিপুল জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীন বাজারে চাহিদার জোরালো পরিস্থিতি বজায় থেকেছে, অন্যদিকে দেশজ চাহিদার সাথে যোগানের সঙ্গতি রাখতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনশীল খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হয়েছে । ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি কর্মসংস্থানও হয়েছে । তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণের কারণে সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে আর্থিক সেবার অন্তর্ভূক্তকরণ সম্ভব হয়েছে । তদুপরি, প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের নিবিড় প্রবাহ অব্যাহত থাকে । এ সব কারণে মানুষের আয় রোজগার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । সামগ্রিক বিচারে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করছে । তাই এই ভয়াবহ মন্দা পরিস্থিতিতেও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে মন্দাপূর্ব বছরগুলোর ন্যায় ৬ শতাংশের আশেপাশের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে । উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত অর্থবছর (২০০৮-০৯) শেষে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৫.৯ শতাংশ । বর্তমান অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধির হার এর ধারে কাছেই থাকবে বলে মনে হয় । জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলে সামনের বছর গুলোতে প্রবৃদ্ধির হার আশাকরি অনেকটাই বেড়ে যাবে ।

অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গভীর বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি চলাকালে উন্নতদেশের ব্যাংকিং খাত যখন চরম সংকটে পড়েছিল, সে সময় বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি মোকাবিলায় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে । এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ রেগুলেটরী ভূমিকা পালন করে । এ সবই সম্ভব হয়েছে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ আর্থিক খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অতুলনীয় দেশপ্রেম, দক্ষতা, দূরদর্শিতা, সুসমন্বয় ও প্রতিকূল পরিবেশে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য শক্তির কারণে।

অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিসম্পন্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নে একটি আধুনিক আর্থিক খাত বিনির্মানে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১০-১৪) কৌশলগত পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে; যার মূল লক্ষ্য বঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌছে দেয়া ।

- **আর্থিক অন্তর্ভূক্তি**

বৃহত্তর সামাজিক অন্তর্ভূক্তিরই এক বিশেষ দিকের নাম আর্থিক অন্তর্ভূক্তি (financial inclusion)। বস্তুতঃ এটি সামাজিকভাবে মানুষকে বাইরে রাখার বিপরীত ধারনা । সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করা এবং তা থেকে সুবিধা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার আরেক নাম আর্থিক বহির্ভূতকরণ (financial exclusion)। আর্থিক অন্তর্ভূক্তি না ঘটার পেছনে যেসব কারণ কাজ করে সেসবের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য সম্পর্কিত নানা বঞ্চনা । যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়া । এ সব বঞ্চনার কারণে অনেকেই কাজের সুযোগ, আয় রোজগার করার সুযোগ, ঋণ পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন । শারিরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গঁ বৈষম্যের কারণেও এ বঞ্চনার উদ্ভব হয় । তাছাড়া, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কারনেও সামাজিক সংঘবদ্ধতা ভেঙ্গেঁ পড়ে এবং সে জন্যে আর্থিক

ও সামাজিক বহির্ভূতকরণের উদ্ভব হয় । সেই অর্থে, উন্নত বা উন্নয়নশীল - সকল দেশেই কোনো না কোনো ধরনের আর্থিক ও সামাজিক বহির্ভূতকরণ লক্ষ করা যায় । তবে দেশে দেশে তার মাত্রা ভিন্ন হতে বাধ্য । সে কারনেই, এমনকি উন্নত দেশেও আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি উন্নয়ন নীতিকাঠামোতে স্থান করে নেয় । তবে বাংলাদেশের মতো কম আয়ের দেশে দারিদ্র্য সম্পর্কিত বঞ্চনা ও বহির্ভূতকরণ আরো তীব্র । আর সে কারনেই তা দূর করার জন্যে নীতি উদ্যোগের খুবই প্রয়োজন এবং তা সব দেশের চেয়ে আরো বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

আমাদের প্রতিদিনের জীবন চলায় আমরা মৌলিক কিছু লেনদেন সেবা যেমন আমানত গ্রহণ, চলতি খরচের জন্যে ঋণের দরকার মেটানো অথবা বিনিয়োগের জন্যে কার্যকরী অর্থের দেয়া-নেয়া এবং হিসেব নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় । আর্থিক অন্তর্ভূক্তি মানে এসব মৌলিক আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তি । নগরের অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী ব্যক্তিরা ব্যাংক থেকে এসব মৌলিক আর্থিক সেবা ছাড়াও আরো অনেক বর্ধিত আর্থিক সেবা পেয়ে থাকেন । ব্যাংক ছাড়াও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এবং পুঁজিবাজার থেকেও তারা এসব সেবা পেয়ে থাকেন । কিন্তু, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা খুবই কম । আকারে ছোট লেনদেন হয় বলে তারা গরিব মানুষকে এসব সেবা দিতে উৎসাহী নয় । তাদের মতে, এসব সেবা দিলে তাদের যথেষ্ট লাভ হয় না । তাছাড়া, গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষগুলোর স্বাক্ষতার হার এখনো বেশ কম । সে কারনেও তাদের পক্ষে প্রচলিত আর্থিক সেবা গ্রহণের সক্ষমতা সীমিত । যারা গ্রাম থেকে নগরে এসে কাজ করেন তাদের আবার স্থায়ী ঠিকানা নেই । সে কারণেও তারা আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন ।

গ্রাম কিংবা শহরের গরিব মানুষকে সমবায়ের সদস্য করে আর্থিক সেবা দেবার একটা সরকারী উদ্যোগ শুরুতে লক্ষ করা গিয়েছিল । কিন্তু একবার সমবায়ের সদস্য হবার পর বর্তমান সদস্যরা আর নতুন সদস্যদের যুক্ত হতে দিতে চাইতেন না । তাছাড়া এসব সমবায় এক পর্যায়ে 'এলিট'দের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকে । সে কারনেও আর সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বাড়েনি । তাছাড়া, যাদের একদম কোনো সম্পদ নেই কিংবা স্বল্প সম্পদ রয়েছে তাদের জন্যে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল একথা দাবি করাও সংগত হবে না । দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের সমবায়গুলোর ব্যর্থতা সর্বজনবিদিত । তাছাড়া, সমবায়ের রেগুলেটরী প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকাও জোরালো নয় ।

তবে সত্তরের দশক থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটিয়ে ছোট ছোট ঋণ দিয়ে গরিবের আয় রোজগার বাড়ানোর নানা উদ্যোগ চোখে পড়ে । এর ফলে গরিবের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির সুযোগ যে খানিকটা বেড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই । একই সঙ্গেঁ, দ্রুত বেশি করে লাভ দেয়ার কথা বলে অনেক প্রতারণামূলক ঋণদাকারী প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে প্রসার লাভ করেছে। এমন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছেন । এমন প্রতারণামূলক ঋণ কর্মসূচী বন্ধ করার জন্যে এবং বাদবাকী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ভালোভাবে সততার সঙ্গেঁ পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতেই বাংলাদেশ সরকার

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকারবলে এই কর্তৃপক্ষের সভাপতি। সেকারণে, এই কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বেড়েছে তেমনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধানও বেড়েছে। আর তাই এ সব প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে। তা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার মাত্রাতিরিক্ত বলে ক্ষুদ্র ঋণকে ঘিরে জোর বিতর্ক রয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র ঋণ ধারণাটিই বর্তমানে বেশ খানিকটা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। কেউ কেউ ক্ষুদ্র ঋণ শব্দদ্বয়কেও পাল্টে ফেলার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে চলেছেন। নাম যা-ই হোক, ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের জন্যে যে আর্থিক সেবার সুযোগ বাড়ানো দরকার সে নিয়ে কারো দ্বিমত নেই।

মনে রাখতে হবে যে ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা সম্প্রসারণ সত্ত্বেও দেশের জনসংখ্যার এক বড় অংশ এখনও আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত। প্রায় এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে; যাদের অনেককে বয়স ও অন্যান্য শারীরিক অক্ষমতার কারণে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আত্ম-কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। কেবল এই গরীব অংশই নয়, ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের একটি অংশ সফলভাবে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসলেও ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বৃহৎ ঋণ গ্রহণের শর্ত পূরণ করতে পারছে না। ফলে তারা একটি 'হারানো মধ্যবর্তী (missing middle) শ্রেণীতে পরিনত হয়। কৃষি ও এসএমই এর মতন প্রবৃদ্ধি-সহায়ক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বাজার ব্যর্থতা (market failure) ও বাজার ব্যবধান (market gap) বিরজামান, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এ কারণেই দ্রুত ও অধিকতর অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির (financial inclusion) নীতি গ্রহণ করেছে।

- **বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি**

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা মূলতঃ ব্যাংকের শাখা পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারণ, সকল স্থানীয় ব্যাংককে জাতীয়করণ ও সমবায়ভিত্তিক ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক তাদের সদস্যদের আমানত ও ঋণ সেবা প্রদান। দেখা যায়, গ্রামের অবস্থা সম্পন্ন ক্ষমতাবানরাই এ সকল সুযোগ থেকে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু দেশের অগনিত, অশিক্ষিত গরীব মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি। পরবর্তীতে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান এই অচলায়তন ভেঙ্গে আর্থিক সেবা দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানোর চেষ্টা করেছে। অবশ্য তাদের অনেকের কর্মসূচি মহিলাদের লক্ষ করে করা হয়েছে এই বিবেচনায় যে, পরিবারে মহিলারা আর্থিকভাবে শক্তিমান হলে প্রচলিত পুরুষ শাসিত পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন ও সর্বোপরি সন্তানদের লেখাপড়াসহ যাবতীয় বিষয়ে মহিলাদের মতামত অগ্রাধিকার পাবে। ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি এ সব প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক সময়ে খুবই সীমিত আকারে গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য সহনীয় প্রিমিয়ামে মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স প্রবর্তন করেছে, যার আওতায় স্বাস্থ্য, দূর্ঘটনা ও সম্পদহানির মতন ঝুঁকিসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলির সাথে অংশীদারিত্বের

ভিত্তিতে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করছে । ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সালের এক জরীপে (CGAP’s microfinance gateway; www.microfinancegateway.org) দেখা যায়, ১০টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ৬১টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদার হয়ে ৮১টি ক্ষুদ্র বীমা পলিসি চালু করেছে । এ পর্যন্ত ৪৫ লক্ষ গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় এগারোশ কোটি টাকার মতো প্রিমিয়াম সংগ্রহ করেছে।

অবশ্য দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের সফলতার বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণায় এবং সংবাদপত্রে অনেক সময় ঋণ গ্রহীতাদের ঝুঁকি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সুশৃংখল ঋণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার চিত্র উঠে আসে, যা সংশোধনের প্রয়োজন আছে । তাছাড়া, আগেই যেমনটি বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ঋণের কার্যকরী সুদের হার নিয়েও সমালোচনা রয়েছে । ক্ষুদ্র ঋণের অপর একটি সমালোচনা হলো, এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র বিশেষ করে যারা বয়স্ক অথবা অন্য কারণে আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে অক্ষম তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই । এ সব জটিলতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না । তবে যে সব সমালোচনা উঠেছে সেসবের দ্রুত সুরাহা করতে না পারলে ক্ষুদ্র ঋণের গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে ।

ক্ষুদ্র ঋণের ন্যায় আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক সৃজনশীল সামাজিক উদ্ভাবন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন উৎসাহিত করে । উদাহরন স্বরূপঃ এসএমই অর্থায়ন সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের হাল্কা প্রকৌশল শিল্পের প্ল্যান্ট স্থাপন; নির্মাণ, পরিবহন ও কৃষিখাতের খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও সরবরাহে উৎসাহ যোগাবে, যা আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ কমাবে ।

ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসাব খোলার হার ধীর গতিতে বাড়ছে । এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার আওতা বহির্ভূত আছে যাদের কাছে পৌছানো কষ্টকর । কার্যতঃ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি ‘হারানো মধ্যবর্তী (missing middle) শ্রেণী রয়েছে যারা ঋণের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত । ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মূলতঃ এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । তাছাড়া, অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন কৃষি, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ (যেমন সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি) এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সহায়তা প্রাপ্তি থেকে পিছিয়ে আছে ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বর্তমান সরকার আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ব্যাপকতর করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । আমার জন্যে খুবই সন্তোষের বিষয় যে এই মহৎ পালাবদলের প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমি গভীরভাবে জড়িত হতে পেরেছি । কৃষি ও এসএমই খাতে মোট ঋণের পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিসহ (কৃষি খাতে ১১,৫০০ কোটি টাকা এবং এসএমই খাতে ২৪,০০০ কোটি টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন) বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে যুগোপযোগী কৃষি ও এসএমই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে । বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন

(রিফাইন্যান্স) কর্মসূচির পরিধিও বিস্তৃত করা হয়েছে । সকল ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে । এসএমই খাতের সম্প্রসারণ ও তদারকির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পৃথক এসএমই বিভাগ খোলা হয়েছে । এ সবের ইতিবাচক প্রভাব সমাজ ও অর্থনীতিতে এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে ।

এই প্রথম বারের মতন শুধুমাত্র বর্গাচাষীদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে । যা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক গ্যারান্টি রেখে একটি অ-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । ইতিমধ্যে দেশের ৩৫টি জেলার ১৫০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে । এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৮৯৭টি গ্রুপ (পুরুষ) গঠন করে ৬৮ হাজার ৬৩৪ জন বর্গাচাষীকে ৫০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বিতরন করা হয়েছে । তাছাড়া, ২৮টি মহিলা বর্গাচাষী গ্রুপ গঠন করে ৪২৫ জন মহিলাকে ঋণ বিতরনের প্রক্রিয়া চলছে । আগামী জুন মাস নাগাদ মহিলা গ্রুপের সংখ্যা ৭০০ তে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে । প্রথমবারের মতো মহিলা বর্গাচাষীদের জন্যে ঋণ প্রদানের এই সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরে বাংলাদেশ ব্যাংক খুবই তৃপ্ত ।

দেশের গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌছাতে ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখা খোলার উপর জোর দেয়া হয়েছে (প্রতি ৫টি শাখার মধ্যে একটি অবশ্যই পল্লী শাখা হতে হবে) । ব্যক্তি খাতের ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকই বর্তমানে গ্রামীণ শাখা খোলার জন্যে আগ্রহ দেখাচ্ছে । চলতি বছর ব্যাংকগুলো শাখা খোলার জন্য যে আবেদন করেছে তার প্রায় ৬৭ শতাংশই গ্রামীণ শাখার জন্যে করা হয়েছে ।

কৃষকদের জন্য সরকারের দেয়া সার, বীজ, জ্বালানী ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহায়তা সরাসরি কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তরের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে ১০/- টাকায় কৃষক একাউন্ট খোলার নির্দেশ দিয়েছে । ইতিমধ্যে প্রায় ৮৭ লাখ কৃষক নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুলেছে । তাছাড়া ব্যক্তি খাতের ব্যাংকগুলোকেও তাদের পল্লী শাখায় কৃষক একাউন্ট খোলার তাগিদ দেয়া হয়েছে । আশা করা যায় কৃষকদের একাউন্টে ভর্তুকিসহ নানাবিধ আর্থিক লেনদেন সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকে বেগবান করবে ।

- **আর্থিক সেবায় আধুনিক প্রযুক্তি**

আর্থিক সেবা স্বল্প খরচে ও দ্রুত সাধারণ মানুষের নাগালে পৌছাতে প্রযুক্তি নির্ভরতার বিকল্প নেই । দেশের দ্রুত বিকাশমান আর্থিক খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ নজর দিয়েছে । দেশের সর্বত্র বিস্তৃত মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ব্যবসা-বানিজ্য ও ব্যাংকিং সেবায় আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে । 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যেই ই-কমার্স ও ই-ব্যাংকিং প্রবর্তন করেছে । বেশ কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকদের দিতে শুরু করেছে । বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ফোনের

নেটওয়ার্কের সর্বোত্তম ব্যবহার করে ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা ও মোবাইল ফোন কোম্পানীর মধ্যে আইটি প্লাটফর্ম গড়ে সৃজনশীল cost-effective আর্থিক সেবা প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছে । কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথাযথ নীতির আওতায় এই ধরনের উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃতি আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বেগবান করবে । এই সব প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তনের কারণে গ্রামীন জনপদে স্বল্পসময়ে ও সহজে প্রবাসীদের রেমিটেন্সের অর্থ পৌছানো; তহবিল স্থানান্তর ও বিল পরিশোধসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং লেনদেন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্ভব হচ্ছে । এর ফলে হুন্ডিসহ অবৈধ অর্থের লেনদেন কমে আসবে বলে আশা করা যায় ।

মোবাইল ফোনের ব্যবহার ব্যাংক ঋণের তদারকিতেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে । কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইতিমধ্যেই সকল গ্রাহকের মোবাইল ফোন সংরক্ষণ করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও মোবাইল ফোনে কৃষকদের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের ঋণ প্রাপ্তি ও নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা হচ্ছে ।

লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ব্যবস্থা ‘স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর’ (Automated Clearing House) এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গত নভেম্বর ২০০৯ থেকে শুরু হয়েছে । আশা করা যায়, আগামী মাস নাগাদ তা পুরোদমে চালু হবে । এর ফলে বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকগণ ঢাকা শহরে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে চেকের লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে । তাছাড়া, ঋণ তথ্য আদান প্রদানের জন্য অনলাইন প্রবেশাধিকারসহ সিআইবি (Credit Information Bureau) কে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করা হচ্ছে । এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অনলাইনে ঋণ গ্রহীতার সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করে দ্রুত ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন গতি সঞ্চার করবে । বাংলাদেশ ব্যাংকও তার নিজস্ব সেবার মানোন্নয়নে প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসগুলোর মধ্যে অনলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন, ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ নানাবিধ প্রযুক্তি ভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশগ্রহণে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত দেশব্যাপী ‘রোড শো’ সাধারন মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা বিশেষ করে আমানত, এসএমই ঋণ, অবৈধ পথে অর্থপাচার প্রতিরোধ ও বৈধ পথে রেমিটেন্স বিষয়ে ব্যাপক সচেতনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, যা দেশের আপামর জনসাধারনকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে ।

- **সৃজনশীল আর্থিক সেবা**

দরিদ্র-বান্ধব ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্থিতিশীল আর্থিক খাত গড়ে তুলতে সৃজনশীল আর্থিক সেবা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে । ব্যাংকিং সেবায় মানবিক ধারনার অন্তর্ভূক্তিকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোকে প্রতিবন্ধী, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য সিএসআর এর আওতায় আর্থিক সাহায্য/

সেবা সম্প্রসারণের তাগিদ দেয়া হয়েছে । ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যক্তি খাতের ব্যাংক এ ব্যাপারে কর্মসূচি চালু করেছে ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সহায়ক পরিবেশ-বান্ধব টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ব্যাংকিং সেবায় 'গ্রীন ব্যাংকিং' এপ্রোচ প্রবর্তন করা হয়েছে । গ্রীন ব্যাংকিং এর আওতায় নবায়ন যোগ্য জ্বালানী যেমন সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জপরিশোধন প্লান্টে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম বারের মতন ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি চালু করেছে । ইতিমধ্যে ১৮টি বানিজ্যিক ব্যাংক এই খাতে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে MOU স্বাক্ষর করেছে । দেশের বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও ২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করেছে ।

পরিবেশ-বান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতের অন্যতম 'বায়োগ্যাস' বাংলাদেশের মতন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় খাত । কারন, কৃষির প্রধান উপখাত শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকরা বর্তমানে মৎস্য ও পশুপালন করছে । একটি বায়োডাইজেষ্টার প্লান্ট স্থাপন করে ৩/৪টি গাভী পালন করে একজন কৃষক উদ্যোক্তা দৈনিক ১২-১৫ লিটার দুধ, ১০০ কেজি জৈব সার ও ১৩৫ ঘন ফুট বায়োগ্যাস উৎপাদন করতে পারে । দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্ত ৩টি বাই-প্রোডাক্ট অর্থনীতিতে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে; উৎপাদিত দুধ দিয়ে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ; রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসাবে জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি; উৎপাদিত বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয় তথা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।

আশার কথা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুযোগ গ্রহন করে একটি ব্যক্তিখাতের ব্যাংক এরই মধ্যে মানিকগঞ্জে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে বিনিয়োগ করেছে । ইতিমধ্যে দেশের অন্যান্য জায়গা থেকেও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তরা যোগাযোগ করছে । তাছাড়া, বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনে বাংলাদেশ ব্যাংক আইপিএফএফ প্রোজেক্ট এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে । ইতিমধ্যে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে । সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ২৫৭ মিলিয়ন মাঃ ডঃ এর একটি তহবিল এই খাতে বিনিয়োগের জন্য সরবরাহ করেছে। তাছাড়া, জ্বালানীসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যে পর্যাপ্ত তহবিল গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল আর্থিক খাত নিশ্চিতের জন্য ব্যাংকিং খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উত্তরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কর্পোরেট গভর্ননেন্সসহ ব্যাংকিং রেগুলেশনে ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে । তাছাড়া, রপ্তানিকারকদের মূলধন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানির জন্য ইডিএফ (এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড) এর বর্ধিত সুবিধা, পূর্বের ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়েছে; জরুরী প্রয়োজনে 'এক্সপোর্ট রিটেনশন কোটা' একাউন্ট থেকে আগাম গ্রহনের সীমা ৫ হাজার মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ১০ হাজার মার্কিন ডলার করা হয়েছে । আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় ও

যৌক্তিক সুদের হার নিশ্চিত করতে ২০১০ সালের জানুয়ারী থেকে Dhaka Inter-Bank Offer Rate (DIBOR) প্রবর্তন করা হয়েছে ।

সম্প্রতি দুইটি আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি (Standard & Poor ও Moody's) এর মূল্যায়নে বাংলাদেশ যথাক্রমে BB-(BB minus) ও Ba3 রেটিং অর্জন করেছে, যা সন্তোষজনক বলা যায় । উভয় সংস্থাই বাংলাদেশকে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বিশ্বস্ত গন্তব্য হিসেবে অভিহিত করেছে । মূলতঃ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, প্রবাসীদের রেমিটেন্সের নিবিড় প্রবাহ ও তৈরী পোষাক শিল্পের রপ্তানি আয়ের মানদন্ডে বাংলাদেশ এই সন্তোষজনক আন্তর্জাতিক রেটিং অর্জন করেছে । বাংলাদেশের এই রেটিং বেসরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বল্প খরচে ও সহজ শর্তে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের পথ সুগম করবে, যা দেশের ব্যবসা-বানিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকে বেগবান করবে । তবে রিপোর্টে রাজস্ব আয়ের দুর্বল ভিত্তি এবং রপ্তানি খাতের বহুমূখীকরণে দুর্বলতাকে ভাল রেটিং এর অন্তরায় বলে মন্তব্য করা হয়েছে । এ বছর বাংলাদেশের রাজস্ব আয় জিডিপির দশমিক আট শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে । রাজস্ব প্রবৃদ্ধির এই ধারা বজায় রাখা সম্ভব হলে উন্নয়ন বাজেটের আকারও বাড়বে । বাড়বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি । আর সে কারণে ধরে রাখা সম্ভব হবে বাংলাদেশের মোটামুটি সন্তোষজনক এই রেটিং ।

- **উপসংহার**

নিঃসন্দেহে, আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণে এ যাবত কালের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক । প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত সেবার আওতায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা এসেছে । তবে ঋণ সেবাসহ অন্যান্য আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার এখনও সীমিত রয়েছে । ছোট আকারের ঋণ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বেশী বিধায় সুদের হার/সার্ভিস চার্জ উচ্চ মাত্রায় রয়েছে । এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার; ব্যাংকের নেতৃত্বে স্মার্ট কার্ড/মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন ছোট আকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার খরচ কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে । যেহেতু দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যা মোট প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, সুতরাং ঋণের ছাড়করণ ও আদায়ে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা খরচ কমিয়ে আনবে এবং বর্তমানে বাদপড়া ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসাকে উৎপাদন কর্মকান্ডের জন্য ঋণ গ্রহণে সক্ষমতা বাড়াবে এবং ঝুঁকিও কম থাকবে।

যুগোপযোগী উন্নত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি দারিদ্র্য মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে পারে । ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে আর্থিক সেবায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ cost-saving কৌশল উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ, যাতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বিরজমান ব্যবধানটা আরো কমে আসে ।

এ কথা ঠিক যে, আর্থিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সবার জন্য একবারেই নিশ্চিত হয়ে যাবে এমন নয় । প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট নানাবিধ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী প্রায়শঃই দুর্ভোগের শিকার

হয় । এমনকি দারিদ্রের সংজ্ঞাও একটি তুলনামূলক বিষয় । একটি স্বচ্ছল সমাজেও বিরাজমান অতিমাত্রার অসাম্য সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । এই কারণেই এমনকি উন্নত অর্থনীতিতেও সামাজিক নীতি কাঠামোতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ।

তবে, সাধারণ মানুষ আজ অনুধাবন করতে পেরেছে যে, আর্থিক সেবা এখন আর তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয় । এ কথাটি মানতেই হবে যে, মানুষের মনে এ আশা জাগানিয়া কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে গভীরভাবে জড়াতে পেরে আমি বেশ খানিকটা তৃপ্ত । তবে আরো অনেকটা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে । সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো দরিদ্র-সহায়ক না করা গেলে দারিদ্র্য নিরসনে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয় । তবুও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিতদের জন্যে কি করে ভরসার পরিবেশ তৈরী করা যায়; কি করে তাদের আয় রোজগার বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা যায় । কবি গুরুর ভাষায়,

“সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম । তাই যদি হয় তবে কোন দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব । এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ । যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন । আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না । আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব । .... এ জন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেয়া নয়, মনে ভরসা দেয়া।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড পৃ. ৩১৩)